ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1459-1468
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.367

উৎপলকুমার বসুর কবিতা: পরাবাস্তববাদের আধারে আত্মসমীক্ষণ-প্রয়াস

ড. সৌরভ মজুমদার, *স্বাধীন গবেষক, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Utpal Kumar Basu was a Bengali poet who belonged to the so-called 'Turbulent Fifties' of 20th Century. The poets of his generation grew up in an all-encompassing phase of anarchy and anxiety—The Second World War, recurring communal rife, incomplete Indian independence, refugees flocked at Sealdah station—each and every event marked their negative impressions on these tender minds. The typical political belief-system had lost its appeal to them, and without any substitute narrative to put their hope on, they gradually grew apart from the usual Bengali middle-class morals. In a creative frenzy, they tried to create their own narratives by jotting down their very own personal experience and emotions as poetry. This introspective tendency clashed against lost morals, and created a sense of alienation and impotence in the poetry of fifties. Utpal Kumar Basu created his own poetic diction with surrealistic properties. As Surrealism itself was an attempt to express the "true functioning of thought … in the absence of all control by the reason", it resonated well with the self-reflective tendency of Basu's poetry. This liaison between Surrealism and self-reflection in Utpal Kumar Basu's poetry is explored in this article.

Keywords: Utpal Kumar Basu, Surrealism, Self-reflection, Alienation, Impotence

> এই হলেন উৎপল—উৎপলকুমার বসু—বাংলা কবিতায় টারবুলেন্ট ফিফটিজ-এর অন্যতম প্রধান কবি—নির্জন, মিস্টিক, স্বপ্নতাড়িত, ইমেজিস্ট, চতুর, ভূতগ্রস্ত, সুররিয়ালিস্ট, যুগপৎ চেতনানিশ্চেতনায় সাবলীল ভ্রমণকারী, দাদাইস্ট, 'আর্কেটাইপ'(মনস্তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক অর্থে) ও 'ব্যারাক' কারুশিল্পে ভরা এক অভিনব ধরনের রহস্যময় বাংলা-কবিতার পথিকৃৎ বিপ্লবী।[১]

একজন সহ-ব্যবসায়ী কবির চোখে এই ছিল উৎপলকুমার বসুর স্থান— আধুনিক বাংলা কবিতায়। বস্তুত, কবিদের কবি ছিলেন উৎপলকুমার বসু। ভূবিজ্ঞানের ছাত্র এই কবি কবিতায় প্রবেশ করেছিলেন তার কারুকর্মের দিকটিকে সামনে রেখে। বিষয়বাহুল্যকে নিজের কবিতা থেকে বিসর্জন দিয়ে তিনি কবিতাকে করে তুলেছিলেন খনকযন্ত্রের মতো তীক্ষ্ণ, আর তার সূচিমুখকে চালনা করেছিলেন মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে। আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াস তাঁকে বাস্তবের অন্তর্লীন বন্ধনসূত্রগুলিকে অস্বীকার করে ক্রমশ পরাবাস্তব-অভিমুখী করে তুলেছিল, করে তুলেছিল মানবচেতনায় আরও গভীরসঞ্চারণে সক্ষম। নিজের সত্তাকে পরিপূর্ণতায় জানার চেষ্টা

ছিল পরাবাস্তববাদীদের মৌলিক উদ্দেশ্য। নিজ অস্তিত্ব এবং বাস্তবতার কেন্দ্রে পৌঁছনোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁদের একধরনের 'Hamletism'–এর দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, "which is an excessive analysis and study of self"[২]। জয় গোস্বামী উৎপলকুমার বসুকেও চিহ্নিত করেছিলেন সেই কবিদের একজন বলে, "যাঁরা মনে করেন, আমি কবিতাটি লিখতে লিখতে নিজের অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে থাকব। তাতে নিজেকে হয়তো আরও একটু জানা সম্ভব হবে।"[৩] নিজেকে জানার এই বিশেষ প্রবণতাকে আত্মসমীক্ষণাত্মক প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যেখানে 'সমীক্ষণ' শব্দটির অভিধাননির্দিষ্ট অর্থ হল— "সম্যক দৃষ্টি; অন্বেষণ; বিবেচনা; যত্ন; সম্যক জ্ঞান"[৪]; অর্থাৎ 'আত্মসমীক্ষণ' শব্দটির অর্থ হয় 'আত্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান' কিংবা 'আত্ম অন্বেষণ'। পরাবাস্তবিক চেতনায় সমসময়ের প্রেক্ষাপটে নিজেকে স্থাপন করে কবি উৎপলকুমার বসু কীভাবে কবিতায় নিজেকে খুঁড়ে চলেন, ঋদ্ধ হ'ন আত্মসমীক্ষণলব্ধ জ্ঞানে, তা আমরা আলোচনা করতে চাইব বর্তমান নিবন্ধে।

একজন সাহিত্যিককে অবশ্যই হতে হবে সমাজসচেতন— এই ছিল উৎপলের অভিমত। সময়ের নিহিত চিত্ররূপ তাঁর কবিতাতেও ফুটে উঠতে দেখা যায় তাই। এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় উৎপলকুমার বসু বলেছিলেন,

> "তথাকথিত রাজনৈতিক সচেতনতা আমাদের একেবারেই ছিল না। দুটো বড় ঘটনার সন্তান আমরা, এক—দেশ স্বাধীন হওয়া এবং দুই—দেশ ভাগ হওয়া। দলগত মতাদর্শ বা তাত্ত্বিক পড়াশোনার বিশেষ সুযোগ হয়নি তখন ১৯৫৯-৬০ সালে, কলকাতা শহর উদবাস্তুতে ছেয়ে গেছে। শিয়ালদা স্টেশনে দলে দলে উদ্‌বাস্তুর ভিড়। ... যৌনতা, জন্ম-মৃত্যু সবই চলছে ওরই মধ্যে।... চোখের সামনে—হাতের কাছে এগুলো ছিল বলে এতেই বেশি উৎসাহিত হয়ে পড়ি আমরা।"[৫]

চল্লিশ-পঞ্চাশের উত্তাল বছরগুলিতে(১৯৪১-৬০ খ্রি.) কেটেছিল উৎপলের কৈশোর-যৌবন। একদিকে ধরা পড়ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের(১৯৩৯-৪৫ খ্রি.) তীব্র অভিঘাত, অন্যদিকে ঘটে গিয়েছিল ১৯৪৩-এর ভয়াবহ মন্বন্তর(পঞ্চাশের মন্বন্তর)। শহরের রাস্তাগুলি ভরে উঠেছিল অনাহারে মৃত অজস্র মৃতদেহে, রুগ্ন শিশুর ভিড়ে। ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও স্বাধীনতা— এসমস্তই সমসময়ের তীব্র অস্থিরতাকে প্রকট করে তুলেছিল। চল্লিশের মার্কসবাদী লেখকদের 'ক্লাস-কলোনিয়ালিজম-ইম্পিরিয়ালিজম'-কেন্দ্রিক মতবাদ দ্বারা ক্রমাগত এইসব ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের চেষ্টাকে 'সন্দেহ করতে' শুরু করেন উৎপল ও তাঁর প্রজন্মের কবিদল। "এগুলোকে এত সুপারফিসিয়াল লেভেল-এ মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না"[৬], তাঁদের নজর পড়েছিল দেশভাগের 'সাইকিক ইমপ্লিকেশন্স-এর ভয়ংকরতার' দিকে। আর সেইসঙ্গে প্রকট হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক-ক্ষমতাসীন-ব্যক্তিবর্গের বিরাটব্যাপ্ত দুর্নীতির জগতটি। বস্তুত যে অশান্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে বিংশ শতকের সূচনায় ইউরোপে সুররিয়ালিজমের জন্ম হয়, উৎপলের সমসাময়িক পরিস্থিতি তার থেকে খুব ভিন্ন ছিল না। পারিপার্শ্বিক এই সুতীব্র বাস্তবকে অস্বীকার করতেই হয়তো পরাবাস্তবমুখী হওয়া উৎপলের—আত্ম-অন্বেষণে নিজস্ব অস্তিত্বকে অনুধাবনের চেষ্টা, নিজেকে চেনার প্রয়াস। কিন্তু উপরোল্লিখিত প্রক্রিয়াতেই, আত্ম-আবিষ্কার পরিপার্শ্বকেও চিনতে, জানতে, বুঝতে শেখায় কবিকে। সেই পথে এগিয়েই হয়তো সমাজ এবং তার অন্তর্গত বিভিন্ন স্তরের মানুষকে উৎপল দেখেছেন এক করায়ত্ত সত্যদৃষ্টিতে— চারপাশে ঘিরে থাকা বাস্তব ঢেউ তুলেছে অবচেতনার গভীর মহলে। তৈরি হয়েছে পরাবাস্তবতার নিমগ্ন ঘোর, যা বাস্তবকেই নতুন করে দেখতে শিখিয়েছে পাঠককে।

এক আশ্চর্য 'শোভাযাত্রা'র অঙ্গ হিসেবে কবি একের পর এক দেখে যান যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, স্বাধীনতা। সে শোভাযাত্রা পায়নি কোনো 'পরার্থপর মৃত্তিকার দিগন্তনির্দেশ' ('শোভাযাত্রা-১'/ আবার পুরী সিরিজ), ছিল না

কোনো 'কম্পাসের খলনির্ভরতা'। "বস্তু হতে অবাস্তব ভূতের আশ্লেষে/ ক্রমশ লুপ্ত" (ঐ) হয়ে গেছে অজস্র মানুষ। আকাশে উড্ডীন সূর্যও 'শকুনতাড়িত'— "হেলে পড়ে কম্পাসকাঁটায়" (ঐ)। পথ খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও, কেবল 'দূর বিমানের ধাতু-আলেয়ায়' আচ্ছন্ন পড়ে থাকে 'বিপুল এয়ারোড্রোম' বৈমানিকবিহীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনুষঙ্গ টেনে আনে এ পঙ্‌ক্তি, কিন্তু এ বিমানবন্দর এ দেশেরও প্রতীক হয়ে ওঠে— দিশাহীন যে দেশের 'অব্যবহৃত পিচের পথের পাশে' জেগে উঠতে দেখা যায় 'জায়মান মৃত্তিকার শব', আর— "সহস্র একরব্যাপী অনুর্বর জমি, জল, কম্পমান সাঁকো,/ নিরন্ন প্রজার দেশ।" (ঐ) 'বহু বাদুড়ের বিধ্বস্ত ফলের দেশ' পার হতে হয়েছে কবিকে বারবার, প্রতিটি প্রিয় স্মৃতিতে থাবা বসিয়েছে 'উন্মুক্ত ডানার লক্ষ বাদুড়', তাই— "এখন তোমাকে ভাবি ছিন্নত্বক ফলে ও ছায়ায়।" ('শোভাযাত্রা-২'/ঐ) কেবল মনে পড়ে 'গোমড়ক, মন্বন্তর, তপশিলী গ্রামের উৎখাত', আর—

"অতিরিক্ত মনে পড়ে পথ-ঘাট, হা-হা বিদ্যমান
আমানি খাবার গর্ত, মনে পড়ে শূন্য ক্ষেত, ভাঙা ভিটা গ্রাম-গণিকার,
দিগন্তে ধূলির মেঘে, আর্তকণ্ঠ, উপবাসী হাতিদের স্নান।" (ঐ)

বাস্তব প্রেক্ষাপটে আপাত-অসংলগ্ন চিত্র সংযোজনে পরাবাস্তবের পরিসর নির্মাণ করেন কবি। কেবলই রূপকের সীমায় আবদ্ধ থাকেনা কবিতা যখন কবি বলে ওঠেন— "জামের মধ্যাহ্নবনে ঘুরে যায় সে-কড়িখেলার/ বেদনা-আহত হাসি। অত কড়ি পেয়েছিলে ভালো কি বাসায়?" (ঐ) কিংবা,

"আজো জাগরণে
তোমার বাড়ির পথ ততদূর মনে হয়—ওগো প্রিয়, উন্মুক্ত ডানার
লক্ষ বাদুড় ঠেলে যেতে হয় জামের হরণে—" (ঐ)

এ 'জাম' কি কবির প্রেম? তাঁর শৈশব? নাকি কবির অন্তর্গত সত্তা, যার আকাশ আর জমি ছেয়ে যায় দেশভাগের রাজনৈতিক 'কড়িখেলার বেদনা-আহত হাসি'তে? কাঁটাবেড়ার ওপারে ফেলে আসা জামের সন্ধানে যেতে হলে 'অন্তর্গত রক্তের' ভিতরেই কি ভিড় করে আসে 'উন্মুক্ত ডানার লক্ষ বাদুড়'? এই অবচেতনা থেকেই কি ছিটকে উঠে আসে ফাটল-জমির ফাঁকে উত্তপ্ত কান্নার স্রোত, তীব্র অথচ অসহায় এক ব্যঙ্গ—

"এই তো আমার দেশ, দরবিগলিত ভাঁড় দু'হাতে উপুড়—
এই তো আমার দেশ, দরবিগলিত ভাঁড় দু'হাতে উপুড়—
ফাটা গেলাসের শব্দে আমার মাতৃভূমি-জন্মভূমি নির্মীয়মাণ
যা-তোমার হাত থেকে খসে পড়ে তাই আমি সাগ্রহে ধরেছি
শব্দময় মূর্ছায়, পতনে ও আত্মআবিষ্কারে পেতে আছি কান" ('শোভাযাত্রা-৩'/ঐ)

'ফাটা গেলাসের শব্দে' নির্মীয়মান এই কবির স্বদেশ— যেন ভিক্ষার দান কোনো। আমর্ম আকুলতায় যেন প্রশ্ন করেন কবি কোনো অনির্দেশ্য 'তুমি'-কে— "তোমাদের রাষ্ট্রে কেউ ঘোষণা করে কি নেমে 'এবার বিকেল'" (ঐ)। এ বিকেল প্রস্তুতির নির্দেশ বয়ে আনে, ঘরে ঘরে নির্মিত হয় 'অপ্রস্তুত শেল'— "বোনের, বাবার হাতে ঐ সবই গড়ে ওঠে দ্রুত" (ঐ)। 'মশলা-ঝাড়ার গান' থেমে যায়, 'উৎকেন্দ্রিক কুলো' ঘেমে ওঠে মায়ের, দাসীর হাতে। মনে পড়ে ইয়েটস-এর 'The Second Coming' কবিতার অমোঘ পঙ্‌ক্তি— "Things fall apart; the center cannot hold;/ Mere anarchy is loosed upon the world,"[৭] ('The Second Coming'/ Michael Robartes and the Dancer)। 'জাতীয়তাবাদী কৃমি'র আক্রমণে রুগ্‌ণ শিশুতে ভরে ওঠে দেশ।

অথবা রুগ্নতা এ দেশেরই শৈশবকালীন। সে রুগ্ন , 'রক্তমাখা প্রেত'-এর মুখোমুখি হয়ে বিপন্ন বোধ করেন কবি—

"আমি বরাবর রাস্তার
উপরে হেঁটে দেখেছিলাম পথ শেষ হয়ে যায় গাছের বিচূর্ণ রঙিন জালে যেখানে সমাধি
আর প্রসূতির হাসি আর রক্তমাখা প্রেত, তার ভয়াবহ প্রশ্ন ও বিচার"
('ভোর থেকে দেখেছি আগুন'/ আবার পুরী সিরিজ)

শিশুকে সুস্থ ভবিষ্যৎ দেওয়ার দায়িত্ব পিতার— "পিতা, তুমি খরশান, তুমি তাপ ও বিদ্যুৎ একাধারে" (ঐ)। কিন্তু একজন পিতা হিসেবে কবি শিশুকে সেই নিরাপত্তা দিতে পারেননা। শিশু এবং পিতা—দুটি ধারণাই (concept) এখানে সামাজিক গ্রাফপেপারের ত্রিমাত্রিকতায় বিস্তৃত হয়ে যায়। "ঐখানে শত শত শূকর ছাগল মেষ ভোর ও রাত্রির অব্যবহিত সময়ে আমাদেরই জন্য নিয়ে আসে রক্তাল্পতা ও কিলোওজনের অর্ধেক চাঁদ" (ঐ) রক্তাল্পতায় ভোগা, রুগ্‌ণ শিশুর মুখ নিয়তির মতো কবির চেতনে-অবচেতনে হানা দিয়ে যায় বারবার। ওদিকে 'উৎসব' উপলক্ষ্যে শূকর ছাগল মেষের মতোই বিনা-প্রশ্নে মরে যেতে থাকে মানুষ, যেমন "শব্দহীন ভোরের বাতাসে জল কল থেকে পড়ে যায়" (ঐ); বাড়ির উঠোনে স্তূপাকৃতি হয়ে ওঠে 'শেষরাত্রির মাংস'। খড়্গ— হত্যাকারী— সে আর ঐ শিশুর পিতা যেন একই ভূমিকায় অভিনয় করে চলে— "খড়্গ, তুমি তাপ ও বিদ্যুৎ একাধারে" (ঐ)।

"আমার মাথায় আজ জমে ওঠে জঞ্জাল, যেন বান সরে গেছে ঢালু আঘাটার দিকে,
যেন পরিত্যাগ, আমি খুঁজে পাই সোডাবোতলের ছিপি, তাই আবিষ্কার মনে হয়—মাতাল
হিসেবে আমি প্রতিশ্রুত—মাতাল হিসেবে আমি কিছু গান ভেবে নিতে পারি—আমি
ভোর ও রাত্রির অব্যবহিত সময়ে স্ত্রীলোকের কানে মুখ রেখে বলি: তুমি কংগ্রেস।"(ঐ)

কুমাতার মতোই কংগ্রেস প্রসব করে এই রক্তাল্পতা-রুগ্‌ণ, অর্ধেক চাঁদের মতো বিভক্ত স্বদেশ। 'অস্বাভাবিক লোমবীজাণুর ভিতরে ডুবে গিয়ে' এই শিশু স্বদেশ আঘাত হানছে মধ্যবিত্তের বিলাসী অন্ধকারের দরজায়, থাকতে দিচ্ছে না তাকে আড়ালে। একই পটভূমিকায় 'ধ্বংস ও সূর্যোদয়' খেলা করে যায় এখন।

"...তবু আমার আত্মায় কোনো ভঙ্গিমা জাগে না ইউক্যালিপটাস থেকে অমাবস্যা
অন্ধকারে পাখি উড়ে যায় আমার নিরুজ্জ্বল ভবিতব্যতার কথা ভাবি তুমি আমার সন্তান
নও তাই আমার আত্মার চেয়ে সহজ চাতুর্যময় তোমার যাবার ভঙ্গি তোমার যাবার
পথে আমি নেশাতুর চোখ মেলে দেখে নিই উলঙ্গ মেয়েরা ক্রমাগত গ্রাম আক্রমণ
করে এবং প্রকাশ্য মাঠে রামধুন গী'ত হয় এবং স্বল্পমূল্যে পুংমহিষের পুরুষত্ব নষ্ট করা
চলে তবু বেদনা জাগে না আজ কিছুতেই।" ('প্রকৃতির ছবি'/পুরী সিরিজ)

এই নেশাতুর অসংবেদ আসলে সমাজমানসেরই সাধারণ ধর্ম। 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে নিয়েই সন্দেহ ওঠে— যেন সে 'সভ্যতার নাভির ভিতরে' আচ্ছন্ন এক 'নির্নিমেষ করুণ অঙ্গার', ক্রেমলিনে, যুক্তরাষ্ট্রে, কিংবা 'বৈকুণ্ঠের যৌন মখমলে' ধোঁয়ায় আবিষ্ট থাকে সে, 'হিন্দুর জিজ্ঞাসা নয়।' আসলে—

"শুধু কিছু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের
কেবলই মঙ্গল করো। তুমি আপেক্ষিক
অন্য সকলের প্রতি— যেহেতু বিভেদ
'আন্তর্কজাতিক' বলে উদ্যত মুষল— যেহেতু মানুষ

রেডিওর মতো এক অর্বাচীন বক্তার সম্মানে
পরিবারসহ শ্রোতা। যেহেতু কাগজে
নিত্যই সম্পাদক ছাপার কলের সঙ্গে কী ভাবে সঙ্গম করে—
তারই বিবরণ ধুরন্ধর লিখেছে বিশদ" ('ফেরীঘাট'/পুরী সিরিজ)

মনে হয় সূর্যও যেন শ্রেণিভেদে বিশ্বাসী— সে "সাবলীল সোনার গাছের/ প্রচ্ছায়ায়, অন্ধকারে সমস্ত তৃণের রোমে একইসঙ্গে/ ক্ষুধা ও চুম্বন" স্তম্ভিত করে রাখে বলে মনে হলেও, দিনের শেষে অপরাহ্নের ফুল ঝরে যায়, একে একে মরে যায় অরণ্যের গাছ— "প্রার্থনারত কঙ্কালের বাহুবদ্ধ ছায়া/ খুলে ফেলে একে একে কৌতুহলহীন ত্বক, মাংসের জটিল/ উপশিরাগ্রস্ত পাতা।", কারণ—

"কেননা দিগন্তে তুমি
কীর্ণ হয়ে উঠে এলে এইমাত্র—কেননা সোনার গাছ
গ্রাস করে বেড়ে ওঠে—বেড়ে ওঠে উন্মাদ হাওয়ায়
অন্য সব ফুল, ফল, জীবের বিজ্ঞান
সাম্যতার, প্রতিসাম্যতার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে" (ঐ)

ক্ষুধা থাকে এক শ্রেণির জন্যে— 'ক্ষীরের আর্শি' থেকে যে যক্ষ্মা-রোগিনীরা 'স্বাস্থ্য ভিক্ষা' করেছিল, দিল্লীর যে বাসিন্দা চেয়েছিল 'ফলের আর্শি' থেকে একবাটি 'স্বচ্ছন্দ রস', যে মৃত্যুপথযাত্রীরা চেয়েছিল 'দুধের আর্শি' থেকে 'দীর্ঘ পরমায়ু'—ক্ষুধা তাদের জন্যেই প্রসারিত। আর চুম্বন তাদের প্রাপ্য, যাদের জন্যে মাটির গর্ভ খুঁড়ে অর্জিত হয় লোহার আকর, যাদের 'মঙ্গলে পরস্পর প্রতিবন্ধে' লোহা গড়ে তোলে 'এঞ্জিন, স্তব্ধ রেল, সাঁকো, বাড়ি, কলোনি, বাজার'। এসব 'ধূলির খেলা' ফেলে দিয়ে কবিও অন্য সকলেরই মতো 'ধ্রুব তত্ত্বে, আত্মজিজ্ঞাসায়' ফিরে যেতে চান যৌবনে, কিন্তু প্রশ্ন থেমে থাকে না—

"তবু আত্মরতিহীন কোন সৌরময়দানে আধিপত্য মানুষের?
তবু ব্যথাহীন কোন্ বিচ্ছেদের নীল?
কোন্ মৃত্যু ঔদাসীন্যহীন?" (ঐ)

এসব 'বিপরীত প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ, ইচ্ছা' কবিকে তাড়িত করে। "কুয়াশায় রাজহংসের ফৌজ দৌড়ে চলে যায়" (ঐ), "কেননা সমস্ত হাঁস যুদ্ধের সন্তান" (ঐ)। সৌন্দর্যের প্রতিনিধি হয়ে আর বাঁচে না হাঁসের দল। জ্যোৎস্নায় যে উৎসব শুরু হয়, সে 'এক জাগতিক, বাঁকা উপত্যকা'—"চাঁদের প্লাবন, শিরা, রক্ত, বুদ্ধি, তীব্রতা ডিমের/ ফুল ফোটানোর আগে" (ঐ)। অবচেতনার গভীর, গভীরতর অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে উঠে আসে এসব চিত্রকল্প, যা সমকালীন বিদীর্ণ বাস্তবকে তার প্রকৃত চেহারায় তুলে ধরে। বস্তুত, "Surrealism is the explosion of a society, beneath the repressive anguish of an antiquated morality."[৮] মানুষ কেবলই ঘুরে যায় 'যুদ্ধে, জন্মে, যোনির শিখরে'। বিচ্ছেদের মতোই কষ্টকর হয়ে ওঠে জন্ম, আর 'গম্বুজের ভাঙা দেওয়ালের মতো'ই ভয়ঙ্কর যাবতীয় 'রক্তপাত'। অনুভূতির ধারগুলি মরে মরে যায় মানুষের, জন্ম-মৃত্যুর বোধ ক্রিয়াশীল হয় না। 'হেমন্তলীন, পাতার ঔরসে' জাত মানুষের সত্তা আজ "নির্বেদ শূন্যতায় ঝরে যাওয়া ত্যক্ত বিপুলতা" (ঐ)।

আত্ম-সমীক্ষণে প্রয়াসী হয়ে উৎপলকুমার বসু নিজস্ব নিয়তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। অনুভব করেছেন, বনের ভিতরে উদ্দেশ্যহীন ঘোরা দমকলের মতোই নিয়তি তাঁর—উদ্দেশ্যহীনতা এবং অক্রিয় এক 'অগ্নিনির্বাপক ক্ষমতা'—

> "বনের ভিতর আজ সকালের উদ্দেশ্যবিহীন দমকল একা একা ঘুরছে আমাকে টেনে
> নিয়ে চলো ঐ অগ্নিনির্বাপক ক্ষমতা আমারো আছে স্ত্রী আছেন পুরুষের আয়ত্তে যেমন"
> ('আমারই প্রাণের দিকে চেয়ে দেখি'/পুরী সিরিজ)

আঁদ্রে ব্রেতোঁর 'Nadja' রচনাটির নায়িকা নাড্জাকে যখন নায়ক জিজ্ঞাসা করে, "who are you?"[৯], তখন তার উত্তর দেয় সে—"I am the wondering soul"[১০]। একা একা ঘোরা উদ্দেশ্যহীন দমকল বোধহয় এই যুগগত নিয়তিরই প্রচারক হয়ে ওঠে। আর সেই সঙ্গে থাকে এক অক্রিয় অগ্নিনির্বাপক ক্ষমতা—যা কবির আয়ত্তে থাকে, যেমন পুরুষের আয়ত্তে থাকে নারী, কিংবা যেমন 'ফুল থাকে দানবীর আয়ত্তে'—আয়ত্তাধীন ক্ষমতা বা অস্তিত্বের কোনো মূল্য থাকেনা কারো কাছেই। বাঁ চোখে ব্যথা হতে কবির ভয় হয়— "অন্ধতা আমার বেশিদূর যাবে কি যৌবনে—না হয় গাড়ির টায়ারচিহ্ন ধরে চলেছি" (ঐ)। অদ্ভুত এক অসুস্থ পরিণতিহীন যৌবনে পথ চলা কবির। ঘটনার অর্থহীন 'টায়ারচিহ্ন' ধরে এগিয়ে চলা এখন মানুষের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়— এমনকি মৃত্যুও সেখানে মুক্তির আশ্বাস নয়, কেবল অভ্যাসের পদাঙ্ক অনুসরণ—"যেখানে মরণশীল উদ্ভ্রান্ত মোরগ ক্রমে উড়ে যায় মৃত্যুর পরেও লাল টালি-বারান্দায়" (ঐ)। 'ভরাট লেবুর মতো' পৃথিবী পর্যবসিত হয় 'গোল অর্থহীনতা'-য়— "ফাঁপা, নিষিক্ত ও সহিষ্ণু জীবন ও জীবনব্যাপী কলরোল" ('স্মৃতি'/পুরী সিরিজ)। অদিতির বাণী হয়ে দাঁড়ায় শুধু— "যুবক নষ্ট কোরো না বীজ" ('আমারই প্রাণের দিকে চেয়ে দেখি'/ঐ)—আর 'নভোরশ্মির শাদা জরিপোষাকের দিকে' তাকিয়ে কবি অনুধাবন করেন জীবনের সারাৎসার— "'যায় দিন, গ্রীষ্মের দিন যায়, যায় সূর্য, যায় দুর্ঘটনা'" (ঐ)। এক অর্থহীনতা, লক্ষ্যহীনতা, পরিণতিহীনতার আবর্তে পড়ে কেবলই 'জীবন যাপন' করে চলে মানুষ। পুরুষেরা ব্যস্ত থাকে 'সব্জির কাজে' আর 'স্ত্রীলোকেরা গোয়ালের কাজে', দুর্ঘটনার খবরের প্রতিক্রিয়া হয় 'চলো দেখে আসি'। দমকলের মতোই মানুষ শুধু উদ্দেশ্যহীন ঘুরে যায় গভীর বনে—দাবানল নেভানোর দায়িত্ব নেয় না কেউ, কারণ সকলেই জানে, 'যায় দিন, গ্রীষ্মের দিন যায়, যায় সূর্য, যায় দুর্ঘটনা'। স্বপ্নের মতো এই কবিতায় পরপর কতকগুলি চিত্র উঠে এসেছে যেগুলি আপাতভাবে পরস্পর সংগতিবিহীন। তাছাড়া কালগত সীমারেখা ধ্বস্ত হয়েছে একাধিকবার। 'Physical object'-এর পাশাপাশি 'Supernatural forces'-এর ক্রিয়াশীলতা লক্ষ করা যায়, যা বাস্তব ঘটনাক্রমকে পরাবাস্তবের সীমানায় উন্নীত করে দেয়। নিজস্ব সত্তার পরিচয় খুঁজতে চেয়ে একের পর এক চিত্রে কবি কেবল খুঁজে পান একটিই 'latent content'—যাপনের উদ্দেশ্যহীনতা।

কেবলই উদ্দেশ্যহীনতা নয়। সত্তার গভীরে কবি খুঁজে পান এক কিম্পুরুষ— "খর্ব, খোঁড়া, পারঙ্গম— তার চোখ আমাতে লেগেছে" ('ক্ষুধা-পিপাসা'/ শ্রেষ্ঠ কবিতা)। সে সত্তা তার খর্বত্ব এবং খঞ্জত্ব নিয়েও নদী পারাপারে সক্ষম, কারণ সে দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে পারে। সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ— দুদিকেই তার সমান গতায়াত। কিন্তু "গজগমনের রোষে টলোমল নৌকা দু'টি" (ঐ)। আর অন্যদিকে থাকে অকর্মণ্য, ঘরকুনো এক সত্তা, যে 'চৌকাঠে মাদুর পেতে' বসে থাকে। অন্য সত্তাটির সাপেক্ষে নিজেরই নিষ্ক্রিয়তা সে বোঝে, তাই "হাসি নয়। নীরবতা হয়।" (ঐ)। কিন্তু সেই সঙ্গে অবিশ্বাস্য মনে হয় অপর সত্তার তীব্র গতিশীলতা, প্রশ্ন ওঠে—"হ্যাঁ গা, এঁরা কি বাস্তব?" (ঐ)। 'সেনানীর মতো' দূরে দাঁড়িয়ে সে দেখে— "...এই কাঁকুড়জাঙালে/ সহিসবিযুক্ত অশ্বে শ্বেত রানি, কালো রানি" (ঐ) চলে যায়। আলো আর অন্ধকার— শুভ-অশুভ, আনন্দ-বিষাদ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি—সমস্তই যেন বল্গাহীন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে চলে যায়, আর সেই ঘোড়ার খুরের নিচে মাটি হয়ে ওঠে অনুর্বর, পরিণতিহীন। চোখের আড়ালে থেকে সেই অন্যনির্ভর খঞ্জ, খর্ব সত্তা যেন উকুনের মতোই রক্ত শুষে

নেয়, 'পত্রহীন ডালে ডালে' দেখা দেয় 'সূর্যের বিষাক্ত ছাল'। রোদ আর আলো আনে না, আনে জ্বালাময়, বিষাক্ত মৃত্যু কেবল—

"পত্রহীন ডালে ডালে সূর্যের বিষাক্ত ছাল—কোকিল কি
মরেছে মাদুরে? তার শব উকুনবাস্তব?" (ঐ)

সেই পঙ্গু অস্তিত্ব কবির কানে দেয় আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের মন্ত্র—যেখানে কন্যাসমা নারীও কেবল উপভোগের পাত্রী—তার মেদ-মাংস-রক্ত-অস্থি—সমস্তই 'পানীয়',—"—শোনো, সে-ও বলে—হেথা যে-মেয়েটি দেখছ এ তোমার কন্যা যেন/ একে ক্রিশ্চান রুটির মতো টুকরো করো, গুচ্ছ আঙুরে পেষো, মদ হবে,/ পুণ্য পান..." (ঐ)। 'পিপাসা'-ই কবির নিজস্ব ধর্ম হয়ে উঠুক, তাই চায় সেই সত্তা—"তুমি হও নিজের পিপাসা" (ঐ)। কবি অনুভব করেন, 'বাতাসে উড়ন্ত এক বীজপশু'-র ধর্ম যেন তাঁর অস্তিত্বের চিহ্নায়ক হয়ে উঠতে চায়—"বীজ সেই, যাকে নাম ধরে ডাকি।/সে জেগে ওঠে খিদের জগতে, পশুহননের সন্ধ্যায়, ধুলোর ঝড়ে..."(ঐ)। আসলে এই বীজ তাঁরই সত্তার আরেক প্রকাশ, যার 'ক্ষুধা-পিপাসা' অন্তহীন। মগ্ন চৈতন্যের আশ্চর্য রূপায়ন ঘটান কবি এই কবিতায়—যে চৈতন্যের অন্ধকার গহ্বরে বাসা বেঁধে থাকে অবদমিত,অতৃপ্ত কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষা, যে বুভুক্ষু সত্তা কেবল ফ্রয়েডীয় 'সুখ তত্ত্ব' (Pleasure Principle)-এর অধীন—আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি যার একমাত্র চাহিদা। সে সত্তা যখন ব্যক্তির সচেতন সত্তাটিকে গ্রাস করে নিতে চায়, তখন সে ব্যক্তি যেন এক ক্ষুৎ-পিপাসাকাতর বন্য জন্তু হয়ে ওঠে— "ঐ তার আক্ষেপ শোনো।"(ঐ) লালসা-উদ্রেককারী বস্তুসামগ্রীর ভিড় থেকে কবি দূরে পালিয়ে যেতে চান তাই, চান না তার সমগ্র সত্তা গ্রসিত হোক ঐ বীজপশুর দ্বারা। কিন্তু তার অবস্থান যে কবিরই মনের অতল গহনে, তাঁর বাহ্য সত্তাও যেন সে সত্তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে তাই। পৌরাণিক দৈত্য বাতাপী আর ইল্বল ছিল দুটি আলাদা সত্তা—ইল্বল বাতাপিকে মেষে রূপান্তরিত করে ঋষিদের ভক্ষণ করাতো, আর তারপর তার ডাকে বাতাপি ঋষিদের পেট চিরে বেরিয়ে আসতো। কিন্তু এক্ষেত্রে ইল্বল আর বাতাপি যেন একই সত্তা—বাতাপির অবস্থান যেন ইল্বলেরই অভ্যন্তরে—

"দরজার আড়াল থেকে, ছাদের কার্নিশ থেকে, নারকেল গাছের
মাথা থেকে তাকে আমি দু'বেলা ডাকি
সে একমাত্র আমার ডাকেই সাড়া দেয়
—জানে ইল্বল তাকে ডাকছে।" (ঐ)

বস্তুত কবিতাটির শেষে কবি যেখানে এসে পৌঁছান তাতে কোনো একটি সত্তাকে ভালো, অন্যটিকে মন্দ বলে দেগে দেওয়া যায় না আর। ভালো-মন্দ, ভগবান-শয়তান সমস্ত একাকার হয়ে যায় যেন এখানে। এ কবিতার আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এখানে শার্ল বোদলেরের 'আত্ম-প্রতিহিংসা' (L'Heautontimoroumenos) কবিতাটির এই পঙ্‌ক্তিগুলি—

"আমিই চাকা, দেহ আমারই দলি!
আঘাত আমি, আর ছুরিকা লাল!
চপেটাঘাত, আর খিন্ন গাল!
আমি জল্লাদ, আমিই বলি।"[১১] (অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)

রোম্যান্টিক কবির মতো উৎপল 'পৃথিবীকে শ্বাপদ' আর নিজেকে 'নিষ্পাপ হরিণ' বলে মনে করেননা। 'বলি' এবং 'জল্লাদ' বলে অভিহিত করা না গেলেও, কবি জানেন তাঁরই অভ্যন্তরে বাস করে ভালো মন্দ—দুইধরনেরই

সত্তা। অবিমিশ্র ভালো নন কবি— তিনি নিজের মধ্যেকার শ্বাপদটিকেও চিনতে পারেন, স্বীকার করেন তার অস্তিত্ব।

বস্তুত, গভীরে গিয়ে দেখলে দেখা যায়, উৎপলের কবিতায় তাঁর আত্মগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ব্যোদলেয়ার-কথিত le dandy-র স্বরূপ। ড্যান্ডি হল এমন একজন মানুষ যে সুগঠিত চরিত্র, সুবিকশিত সংবেদনশীলতা এবং বিচারবুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু সে ক্রমাগত চেষ্টা করে একজন অসংবেদী, শীতল ও কঠিন চরিত্রের মানুষ হয়ে উঠতে। "This is a tight fitting musk which he must forge every day in order not to betray himself when in the world."[১২] সে অভ্যাস করে ক্রুরতা এবং সংবেদনহীনতা—এটাই তার সামাজিক মুখোশের অঙ্গ হয়ে যায়। বাহ্য পৃথিবীতে আন্তরিক হয়ে ওঠা মূঢ়তার সামিল—এই ভয় সর্বক্ষণ তার মধ্যে খেলা করে যায়। এই ড্যান্ডি প্রতিটি আধুনিক শিল্পীরই সত্তার পরিচায়ক বলে মনে করেছিলেন ব্যোদলেয়ার। উৎপলও যেন কবিতায় এভাবেই নিজেকে নির্মাণ করেন এবং সমাজের দিকে এগিয়ে চলেন। "কত না নৈকট্যবোধে দূরত্ব বজায় রাখি, বুঝে দ্যাখো।" (১৬ নং কবিতা/পিয়া মন ভাবে)—এ পঙ্‌ক্তি সেই অভিমুখের প্রতিই ইশারা করে।

দৈনন্দিন সামাজিক পরিসরে নেমে এসে কবি লক্ষ করেন,এ প্রজন্মের মানুষের মধ্যে যে সমস্যাটি প্রধান হয়ে উঠেছে তা হল সংযোগহীনতার সমস্যা, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার সমস্যা। এক আশ্চর্য বিনষ্ট প্রজন্মের প্রতিনিধি হয়ে কবি দেখতে পান—

> "... চেনামুখ, তবু কাঁটাতারে ঘেরা
> আন্তর্জাতিক ভূমি, যার গায়ে দিন নেই, রাত্রি নেই
> সাবান ফেনায় মাখা কাঠচাঁপা ফুলগুলি ঝরে পড়ে সামান্য বাতাসে,
> উঠোনপ্রান্তিক দেশে এ-ভাবেই মুক্তি হবে আমাদের:" ('বিজলীবালা'/লোচনদাস কারিগর)

যাবতীয় চেনামুখ ক্রমে পতিত জমি হয়ে যায়। আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়ায় পৃথক হয়ে যায় মানুষ আর ডাক্তার—কেউ কারো ভাষা বোঝে নে, মুখ চেনে না। চেতনার আড়ালে থাকা আদিম অনুষঙ্গে ফিরতে চান কবি—"আমাকে জঙ্গল বলো, ডাকো রেলস্টেশনের ভুলে যাওয়া নামে" (ঐ)। কিন্তু সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। দেখা যায়—

> "ঘুম আর বোঝাপড়ার মাঝখানে ধ্বনিবহুল ধানক্ষেত, সঙ্গীতময় সরীসৃপ আর
> দাদাকে জিজ্ঞেস করি সাহেবগঞ্জ কত দূর" ('বৌভাত'/খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন)

ব্যক্তিগত আর সামাজিকের সীমারেখার মাঝে এসে দাঁড়ায় 'ধ্বনিবহুল ধানক্ষেত', 'সঙ্গীতময় সরীসৃপ'-এর মতো আপাত-অসম্ভব অস্তিত্ব। স্বপ্নের মতো এই অসংলগ্ন জগৎ ক্রমে প্রকাশ করে এক আবিল দ্বন্দ্বের অভিমুখ—

> "—চলেছি স্বাজাত্যবোধে, ভাত খেতে, লুচি-মাংস খেতে
> —এমনকি কুঁদুলে নেপাল চুপে, আলপথে, সঙ্গে চলেছে—তার নিমন্ত্রণ নাই" (ঐ)

'সঙ্গীতময় সরীসৃপ'-এর মতোই আশ্চর্য আবেশ এই অনৃতমদির 'নিমন্ত্রণ-লিপি'-র—যা মানুষকে কেবল বস্তুসমাকলনে পর্যবসিত করে দেয়। 'ছেঁড়া খবরকাগজ' আর 'তোমাদের হৃদয়বত্তা নেড়ে' কোনো তফাৎ দেখেন না কবি, দেখা যায় শুধু "আতসবাজির মর্মে উড্ডীন আঁধার।"('পুরী সিরিজ: ১' / পুরী সিরিজ) কবি অনুভব করেন, "অপার আমার স্বপ্নে অসম্ভব বাণিজ্য চলেছে"—

> "এখন তোমাদের মুখ চামচের মতন উজ্জ্বল
> তোমার বিনষ্টমুখে রুধিরের বিসস্বাদী ডৌল

টলায় নাবিক, পণ্য, কফি, নুন, কস্তুরী, গন্ধক,
নাকছাবিটির হীরা— এত বস্তুগত সবই!" (ঐ)

রোদের আঙুল শুধু 'গরাদের ক্রমপরম্পরা'য় নেমে আসে—আর ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বৃত্তে ঘিরে আসা সেই 'গরাদের স্তব্ধ ছায়া'-র থেকে মুক্তি পেতে কবির 'মস্তিষ্ক, নেশা, চৈতন্য, সমাধি' 'মাল্যবান পাহাড়ের ব্যাকুল লাক্ষাবনে' চলে যায় 'পাদ্রীদের, সন্ন্যাসিনীদের হাতে'। আফিম কিংবা জলের শব্দে যে দেবতার আশীর্বাদ খুঁজে পান কবি, তা তাঁর মগ্নচৈতন্যের তীব্র মুক্তিকামনাসঞ্জাত বোধ—"অখিল শুশ্রূষা এই লাবণি লাবণ্যরাশি এই জল, এই প্রতিকার"(ঐ)। সুররিয়ালিস্ট কবিদের মতোই মৃত্যুকে তিনি এই অসহ্য পণ্যসংস্কৃতি থেকে মুক্তির অন্যতম বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেন—"Surrealism at all times seemed to offer suicide as one alternative"[১৩]—

"মৃতের করুণ বাহু আপনার মাথায় রেখেছ
মৃত্যুই তোমার ঘরে শব্দময়, কোলাহলরত
মৃত্যুই তোমার ঘরে বসন্তের অদ্ভুত স্ফূলিঙ্গ
জ্বালায় বারংবার।" (ঐ)

আবার কখনো এই পলায়নবাদিতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে 'ধ্বনিবহুল ধানক্ষেত'-এর স্নিগ্ধতায় কবির আকাঙ্ক্ষা জাগে— "কোথাও রয়েছে এই সমাজমেঘের মুখোমুখি ছিঁড়ে আসা বিকেলের আলো, ঐ তপ্ত/ উঠোনের চারপাশে কড়াই বসেছে যেন ধুন্ধুমার জংশন পার হয়ে সাবেকি আগুনে/ পুরনো দিনের কয়লা জ্বলমান, ছাঁটা মাটির আড়ালে, ধুলো-খালে, খনির আঁধারে ('বৌভাত'/ঐ) এ বিকেলের আলো যেন এক 'collective unconscious'-এর উদ্ভাস— প্রজন্মান্তরের স্মৃতিবাহী হয়ে আসে এই আলো। 'ধুন্ধুমার জংশন' যেন এই জটপাকানো বর্তমান, যা পেরিয়ে অবচেতন সত্তা চলে যায় সেই দিনে যেখানে 'সাবেকি আগুনে পুরনো কয়লা জ্বলমান'। আসলে এ আগুন জ্বলে পুরনো মানুষের মনে— যারা কর্মসূত্রে পৃথক হয়েও মনে ছিল একাত্ম, এক 'তপ্ত উঠোনের' অধিকারী ছিল তারা—হৃদয়ের উষ্ণতাই ছিল যাদের সম্পদ। কিন্তু সে দিন ফেলে এগিয়ে এসেছে মানুষ অনেকদূর। যদিও কবির আকাঙ্ক্ষা 'আমাদের লৌকিকতা শেষ হোক', তবু তিনি জানেন—"এখন আকাশে দশটা আঙুল জ্বলে। বসুধারা জ্বলে।/ ঘুম পায়। নিমন্ত্রণলিপি শুধু— তার চেয়ে কে আর জাগ্রত!" (ঐ) মানুষের একাত্মতা জ্বলে-পুড়ে যায় শুধু। তবু কবির চেষ্টা থাকে শেষ পর্যন্ত মানুষে-মানুষে বিভেদের অন্ত হোক।

"উদ্বেল আখের বনে, বার্লিক্ষেতে, যবের কিনারে,
তরঙ্গশাসিত তটে, কাপ্তানের বাইনাকুলারে,
শত্রুজাহাজে, পণ্যে, অন্ধকারে গুপ্ত আর্মাডায়
হে সূর্য, আলোকবিন্দু, একই সঙ্গে প্রসারিত করো
তোমার জ্যোতির থাবা—ক্ষুধা ও চুম্বন।" ('ফেরীঘাট'/ঐ)

কবি চান সূর্য যেন 'কুয়াশালীন, খিন্ন প্রাণীর মর্মে' পৌঁছে দেয় ভাষা। 'ক্ষুধা ও চুম্বনের' আলো প্রতিটি মানুষের উপরেই সমানভাবে পড়ুক, এই হয়ে ওঠে কবির শেষতম আকাঙ্ক্ষা।

এক বিনষ্ট, বিক্ষত সময়ের সন্তান উৎপলকুমার বসু তাঁর সমসময়কে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন অন্তরাত্মায়। সেজন্যেই তাঁর সুনিবিড় আত্ম-অন্বেষণের উদ্যোগ— যা তাঁকে নিয়ে যায় পরাবাস্তববাদী কবিদের কাছাকাছি। সমকালীন বাস্তবতার কেন্দ্রে অবস্থানের জন্যে পরাবাস্তববাদী কবিদের নিজেদের অস্তিত্ব, তার মৌল ধর্ম সম্বন্ধে নিগূঢ় সচেতন হয়ে উঠতে হয়। কিন্তু সেই জ্ঞানলাভের উৎস বাহ্য জগৎ নয়, কবির নিজেরই

অবচেতনা। নিজের স্বরূপ অনুধাবন করে কবি প্রসারিত হয়ে যান সমাজকে, সময়কে চেনার, জানার প্রচেষ্টায়— ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির দিকে। ওয়ালেস ফাউলি বলেছিলেন, পরাবাস্তববাদীদের মতে সৎ কবিতা সেটিই যা মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য ক্রিয়াশীল প্রতিটি প্রচেষ্টার অংশ হয়ে ওঠে। একজন কবি যেহেতু সাধারণ জীবনচর্যারই অঙ্গ, প্রতিটি মানুষের জীবনের সঙ্গেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন, তাই তাঁর কবিতার উদ্দেশ্য হবে মানুষে মানুষে বিভেদের অবসান ঘটানো। পরাবাস্তববাদীদের বিবেচনায় কবিতা হল মানুষের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। সুররিয়ালিজম যদি জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয় তাহলে তার প্রধান কর্তব্য মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলা, আর কবির কর্তব্য আত্ম-সচেতনতা থেকে অন্য-সচেতনতায় যাত্রা, এবং সকল মানুষের সম্মিলন ঘটানোর প্রচেষ্টা করা—"Knowledge of self will lead to knowledge of all men and from there to the union of all men."[১৪] বস্তুত, আত্মজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ব্যষ্টি-সমষ্টির আপাত-বিভেদের অবসান ঘটিয়ে এক সম্মিলিত মানবসমাজের নির্মাণ, যেখানে প্রতিটি মানুষ একে-অপরের জন্য দায়বদ্ধ— সুররিয়ালিজমের এই যে লক্ষ্য, তাকে অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং অসামর্থ্যজনিত অসহায়তার বোধই আত্মসমীক্ষণের প্রয়াসের উপজাত ফসল। উৎপলকুমার বসুর কবিতায় এভাবেই পরাবাস্তববাদ ওতপ্রোতভাবে লিপ্ত হয়ে থাকে, এবং এই লিপ্ততাই তাঁর কবিতায় আত্মসমীক্ষণাত্মক প্রয়াসটিকে বিশিষ্টতায় সার্থক করে তোলে।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, সুব্রত। 'উৎপলকুমার বসুর কবিতা'।, গৌতম মণ্ডল সম্পাদিত। 'আদম', একবিংশ বর্ষ, মে ২০১৬, পৃ. ২২০।

২. Fowlie, Wallace, Age of Surrealism, The Swallow Press and William Morrow and co. INC, USA, 1950, p. 20.

৩. গোস্বামী, জয়। 'অন্তর্হিত সিংহ ও বাদুড়ের খোঁজ'। গৌতম মণ্ডল সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ২৩৩।

৪. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সংকলিত)। 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৬৬৯।

৫. সাক্ষাৎকার ২, গৌতম মণ্ডল সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ১৬৬।

৬. ঐ, পৃ. ১৭০

৭. Finneran, Richard J., The Collected Poems of W. B. Yeats, Revised 2nd Ed., Scribner Paperback Poetry, New York, 1996, p. 187

৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর। ভট্টাচার্য, স্বপ্না। 'জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব'। অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৭৯।

৯. Fowlie, Wallace, ibid, p. 117.

১০. Ibid, p. 117.

১১. বসু, বুদ্ধদেব। 'কবিতা সংগ্রহ: চতুর্থ খণ্ড'। দে'জ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৯৮।

১২. Fowlie, Wallace, ibid, p. 37.

১৩. Ibid, p. 24.

১৪. Ibid, p. 139.

আকর গ্রন্থ:

১. বসু, উৎপলকুমার। 'কবিতা সংগ্রহ'। ২য় পরিবর্ধিত সং। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬।

২. বসু, উৎপলকুমার। 'কবিতা সংগ্রহ ২'। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭।